রসায়নের ব্যবহার

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

। ১৩৫০ ।
১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

। ১৩৫১ ।
১৯. রায়তের কথা : প্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

পরবর্তী বর্ষে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

রসায়নের ব্যবহার

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

রসায়নের ব্যবহার

রসায়নের আবিষ্কারের প্রথম থেকেই যে তার ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে, অর্থাৎ রসায়নশাস্ত্রের জ্ঞানকে যে মানুষের কাজে লাগানো হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। নানা জাতীয় তরুলতাগুল্মের ও নানা সহজলভ্য খনিজের ব্যবহার ও মানুষের শরীরের উপর তাদের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার ফলেই একদিকে রসায়নের ও অন্যদিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে বলতে হবে। এই দুই শাস্ত্রের প্রথম ভিত্তি কে স্থাপন করেছিলেন এবং তারপর ধীরে ধীরে এদের ক্রমবিকাশ কিভাবে নানা খ্যাত ও অখ্যাতনামা ব্যক্তির প্রযত্নে হয়েছিল, তার আলোচনার স্থান এই পুস্তিকায় নেই। আমরা শুধু রসায়নের মোটামুটি ব্যবহারের কথাই বলতে চাই। কারণ রসায়নের সব রকম ব্যবহারের কথা বলতে গেলে অনেকগুলি বিরাট গ্রন্থের আবশ্যক হবে। এজন্য এমন বিষয়ের কথা আমরা বলতে চাই যা অবৈজ্ঞানিকের কাছেও অশ্রুতপূর্ব বা অভূতপূর্ব মনে হবে না, একই কারণে রসায়নের যে সব তত্ত্ব মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়েছে বা প্রকৃতির গূঢ় রহস্যের সন্ধান দিয়েছে সেগুলিরও আমরা আলোচনা করব না। তত্ত্বের পরিবর্তে তথ্যেই আমাদের মনোযোগ সীমাবদ্ধ থাকবে।

আমাদের প্রধান আলোচ্য হবে, (১) খাদ্যবস্তুর ব্যবহার উৎপাদন ও সংবর্ধনে (২) মানুষের রোগযন্ত্রণা লাঘবে এবং (৩) মানুষের সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কাজে রসায়নের প্রয়োগ। এসব আলোচনায় আমরা রসায়নের অণু পরমাণু ইলেকট্রন প্রোটন প্রভৃতির কিংবা পরমাণুবাদ ও অন্যান্য রাসায়নিক সূত্রের অবতারণা করব না। আবার আবিষ্কারের ঐতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষারও কোনো চেষ্টা করব না।

প্রথমে দেখা যাক প্রাণীর দেহ ও প্রাণীর খাদ্য এই দুইয়ের সম্বন্ধ-নির্ধারণে রসায়নের সিদ্ধান্ত কী। কারণ দেহই দেহীর এবং খাদ্যই দেহের

অবলম্বন। এই বিষয়ের বিচারে প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করি যে, প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ অনেক মৌলিক বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় গঠিত ও বর্ধিত হয় এবং অনেক ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে চলে। উদ্ভিদের স্বভাব প্রধানত গঠন ও রক্ষণশীল। বাতাস থেকে কার্বনিক অ্যাসিড-গ্যাস এবং ভূমি থেকে জল ও কয়েকপ্রকার খনিজ লবণ মাত্র সংগ্রহ করে উদ্ভিদ সূর্যালোক এবং পত্রহরিতের সাহায্যে শ্বেতসার তৈল এবং প্রোটীন-জাতীয় অসংখ্য জটিল জৈব অণুর সৃষ্টি ক'রে নিজের দেহের নানা স্থানে সেগুলিকে ধারণ করে। এই সব বস্তু থেকে সে নিজে, বা তার শরীর থেকে নিয়ে প্রাণীরা, কার্যশক্তি (energy) লাভ করে এবং শরীরগঠন ও ক্ষয় পূরণের কাজ চালায়। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্ভিদের স্বভাব হচ্ছে শক্তির উপাদানকে উৎপন্ন এবং সঞ্চয় করা। আশ্চর্য এই যে, যে সকল উপাদান থেকে এইগুলির উদ্ভব, তাতে শক্তির মাত্রা অতি অল্প। সূর্যের আলোক ও তাপই যে উদ্ভিদকে এই সকল নিম্নশক্তি বস্তুকে উচ্চশক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে তা সকলেই জানেন। তাদের দেহের এই সঞ্চিত শক্তিবস্তু মানুষ তার দেহ দগ্ধ করে তাপ ও আলোকের আকারে পায় এবং সেই তাপকে রন্ধনকার্যে শীত-নিবারণে বা স্টীম-এঞ্জিন চালাবার কাজে লাগাতে পারে। যে কয়লা পুড়িয়ে বর্তমানে স্টীম-এঞ্জিন চালানো হয় তাও উদ্ভিদেরই দেহের কঙ্কাল।

প্রাণী কিন্তু নিজের দেহে কার্বনিক অ্যাসিড, জল ও খনিজের সাহায্যে শ্বেতসার ইত্যাদি জটিল বস্তু উৎপাদন করতে পারে না, তা সে যতই সূর্যালোক পাক না কেন। তার বদলে তাকে এই সকল শক্তিবস্তু ও শরীরগঠনের উপাদানগুলি উদ্ভিদ থেকেই সংগ্রহ করে ভোজন পরিপাক ও শোষণ ক্রিয়ার দ্বারা শক্তি উৎপাদন, দেহের ক্ষয়পূরণ এবং দেহের বৃদ্ধি ও গঠনের কাজে লাগাতে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাণীর

স্বভাব নির্মাণ বা সংগঠন নয়, তার স্বভাব উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত উচ্চশক্তি বস্তুকে নিজের কাজে লাগিয়ে সেগুলিকে আবার নিম্নশক্তি বস্তুতে (যেমন জল, কার্বনিক অ্যাসিড, খনিজ লবণ ইত্যাদি) পরিণত করা। উদ্ভিদের দেহ থেকে পাওয়া অঙ্গার-মূলক বস্তু কার্বনিক অ্যাসিডের আকারে প্রশ্বাসের সঙ্গে, প্রোটীন ও অন্যান্য নাইট্রোজেন-মূলক বস্তু ইউরিয়ার আকারে মূত্রের সঙ্গে এবং খাদ্যের অপরিপাচ্য অংশ মলের আকারে তার শরীর থেকে নির্গত হয়।

শ্বেতসার, তৈল ও প্রোটীন ছাড়াও কতকগুলি খনিজ লবণ অল্প পরিমাণে প্রাণী ও উদ্ভিদের খাদ্য হিসাবে কাজে লাগে। উদ্ভিদের ফলে বা পত্রে সঞ্চিত টার্টারিক সিট্রিক এবং ম্যালিক (tartaric citric malic) ইত্যাদি কয়েকটি জৈব অম্ল এবং কচিপাতায় সঞ্চিত অ্যামিনো অ্যাসিড ইত্যাদিও প্রাণীর খাদ্য।

শ্বেতসার জাতীয় বস্তুর মধ্যে শ্বেতসার বা স্টার্চ এবং নানাপ্রকার শর্করাই প্রাণীদেহের শক্তি উৎপাদনের কাজে বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। খাদ্যের শর্করা এবং শ্বেতসার পাচকরসের ক্রিয়ায় দ্রাক্ষাশর্করা বা গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয় ও পরে রক্তে প্রবেশ ক'রে শরীরের যাবতীয় তন্তুতে এবং কোষে সঞ্চালিত হয়ে এগুলিকে তাপ এবং কার্যশক্তি দেয়। উদ্ভিদের কোষের আবরণ হিসাবে এবং তুলা পাট শণ ইত্যাদির সূত্রের আকারে আমরা সেলুলোজ নামক যে পদার্থ দেখতে পাই তার রূপান্তরেও দ্রাক্ষাশর্করা জন্মে, কিন্তু উপযুক্ত পাচকরসের অভাবে অধিকাংশ প্রাণীর অন্ত্রেই এটা কোনো শক্তি-উৎপাদনের কাজে আসে না। তবে গরু মহিষ প্রভৃতি রোমন্থক প্রাণীর অন্ত্রে অবস্থিত একপ্রকার উদ্ভিদবীজাণু (bacteria) এই বস্তু পরিপাক করতে পারে এবং তাদের সহায়তায় এগুলি এসব জন্তুর পোষণে কিছু কাজে লাগে।

তৈলজাতীয় বস্তুও প্রাণীদেহে তাপ ও কার্যশক্তি দান করে, সুতরাং বলা যায় যে, বাইরেও যেমন, দেহমধ্যেও তেমনি, এরা দাহের বা শক্তি-বস্তুর কাজ করে। তবে নানা পরীক্ষায় জানা গিয়েছে যে, শক্তি উৎপাদনে তৈলের উপযোগিতা শ্বেতসার বা সেলুলোজের দ্বিগুণেরও বেশি। অর্থাৎ একভাগ শ্বেতসারের দাহনে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়, একভাগ তৈল বা চর্বির দাহনে তার দ্বিগুণের বেশি শক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহে সঞ্চিত শক্তিবস্তু হিসাবে এর মূল্য যথেষ্ট। প্রোটীন থেকেও শক্তি উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু তার পরিমাণ শ্বেতসারের প্রায় সমান। প্রোটীনের প্রধান কাজ হচ্ছে দেহের গঠনবর্ধন ও ক্ষয়পূরণ। শ্বেতসার বা তৈল এই কাজ করতে অসমর্থ। এইজন্য প্রোটীনকে সর্বোৎকৃষ্ট বা সম্পূর্ণ খাদ্য বলা চলে। শ্বেতসার বা তৈলের অণুতে শুধু অঙ্গারক (কার্বন) হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু থাকে। প্রোটীনের অণুতে এগুলি ছাড়া নাইট্রোজেন, সালফার (গন্ধক) ও ফসফরাস-এর পরমাণু থাকে। এই সব পরমাণুই শরীরের তন্তুগঠনে কার্য করে।

শরীরগঠন ও রক্ষণের জন্য এছাড়াও কতকগুলি লবণ-জাতীয় খনিজ বস্তুর আবশ্যক হয়। অস্থি বা হাড়ের গঠনে ক্যালসিয়াম-ফসফেট নামক খনিজ এবং পাকস্থলীর অম্লজারক রস নিঃসারণে সোডিয়াম-ক্লোরাইড (সাধারণ লবণ) বিশেষ আবশ্যক। এ ছাড়া রক্ত ও বিভিন্ন তন্তুতে পটাসিয়াম ম্যাগ্‌নিসিয়াম, ক্যাল্‌সিয়াম ও লৌহের আবশ্যক আছে। এই সব মৌলিক বস্তু আমরা উদ্ভিদের শরীর থেকেই পাই।

একটি ষ্টীম-এঞ্জিনে যেমন তার কার্যের অনুপাতে জল ও কয়লা দিতে হয়, তেমনি প্রত্যেক প্রাণীর দেহের ওজন এবং শ্রমের অনুপাতে তার আহারের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। তবে এঞ্জিনে প্রয়োজনীয় কয়লার

পরিমাণ যত সহজে হিসাব করা যায় তত সহজে একটি প্রাণীর বা মানুষের খাদ্যের পরিমাণ হিসাব করা যায় না। কারণ প্রাণীর খাদ্য অনেক প্রকার হয় এবং এই সব খাদ্যে শক্তিবস্তুর পরিমাণ তাদের প্রকৃতি প্রস্তুতি এবং অন্য বস্তুর মধ্যে তার সমাবেশের উপর নির্ভর করে। তা ছাড়া গত পঁচিশ বৎসরের নানা গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, দাহ্য বস্তু এবং গঠন ও ক্ষয়পূরণের বস্তু ছাড়াও আর-একজাতীয় বস্তু অল্প পরিমাণে প্রাণীর কাজে লাগে, তাদের ভাইটামিন বলে। এই বস্তু-গুলিও প্রাণীরা সাধারণত উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকেই সংগ্রহ করে। কিভাবে এরা শরীরের গঠন বর্ধন ও পোষণে সহায়তা করে তা ঠিক বলা শক্ত। মোটামুটি এগুলির ক্রিয়াকে এঞ্জিন বা মোটরগাড়িতে ঘর্ষণ-সহ তৈলের (lubricating oil) ক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করা চলে।

খাদ্য থেকে শক্তি-উৎপাদনের কাজে প্রথম পর্যায় হল তার পরিপাক। পরিপাকের পর খাদ্যাংশগুলি রক্তে বাহিত হয়ে শরীরের প্রত্যেক তন্তুতে ও কোষে পৌঁছায় এবং এই স্থানেই তাদের রূপান্তর ঘটার ফলে, বিশেষত বায়ু থেকে সংগৃহীত অক্সিজেন গ্যাসের সঙ্গে মিলনের ফলে, তাপের ও কার্যশক্তির উদ্ভব হয়। মানুষ ও উচ্চস্তরের অন্য জীবের শরীরের গঠনে নানা বিভেদ থাকলেও এই পরিপাক ও পরিবেশনক্রিয়া অনেকটা একভাবেই ঘটে। এই পরিপাকক্রিয়ায় কতকগুলি বিশেষ পাচকরসের দরকার হয়। এইগুলিকে "অন্তঃকোষজারক" বা এনজাইম (Enzyme) বলে। এদের প্রধান কাজ শ্বেতসার, তৈল ও প্রোটীন প্রভৃতি খাদ্যবস্তুর জলের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে এমনভাবে সরলতর বস্তুতে পরিণত করা—যাতে সেগুলি সহজে পরিপাক-যন্ত্র থেকে রক্ত বা রসনালীতে প্রবেশ করতে পারে। এই ভাবে মুখের লালা নিঃসৃত টায়ালিন (ptyalin)-জারক শ্বেতসারকে শর্করাতে এবং পাকস্থলীতে

নিঃসৃত পেপসিন-জারক প্রোটীনকে পেপটোর্মন নামক সরলতর বস্তুতে পরিবর্তিত করে।

শর্করা বা শ্বেতসার জাতীয় বস্তু উদ্ভিদের ফল মূল কাণ্ড ইত্যাদিতে যেমন সঞ্চিত থাকতে পারে প্রাণীদেহে তেমন থাকে না। শুধু গ্লাইকোজেন আকারে কিছু যকৃৎ ও মাংসপেশীতে সঞ্চিত হয়। দৈহিক পরিশ্রমের সময় এই বস্তু আবার রক্তে সঞ্চালিত হয়ে পেশীতে নীত হয় এবং সেখানে শক্তিসৃষ্টির কাজে লাগে। তৈলজাতীয় বস্তু কিন্তু চর্বির আকারে প্রাণীদেহের বিশেষ অংশে সঞ্চিত হয়, এবং অনাহার বা পরিশ্রমের সময় এই সঞ্চিত শক্তিবস্তু আবার রক্তে চালিত হয়ে পেশীগুলিকে শক্তিদান করে। প্রোটীনজাতীয় বস্তু শরীরের গঠন ও বৃদ্ধির ও নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষয়পূরণের কাজে লাগলেও সেগুলিকে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা প্রাণীদেহে জানা নেই। তৈলজাতীয় বস্তু দাহ্য হিসাবে উত্তম হওয়াতে শরীরে এগুলির সঞ্চয়ের ব্যবস্থা খুবই হিতকর সন্দেহ নেই।

জারকরসগুলির বিশেষত্ব এই যে, বিভিন্ন বস্তুর পরিপাকে বিভিন্ন জারকরস শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে নিঃসৃত হয়। এই পরিপাক-প্রক্রিয়াকে জলেরই ক্রিয়া বলা যায়। আবার একই জারক জলের সাহায্যে বিভিন্ন খাদ্যাংশগুলিকে পুনরায় সংশ্লিষ্ট করে শ্বেতসার, তৈল এবং প্রোটীনের পুনর্গঠন করতে পারে। এই কার্যে খাদ্যাংশগুলি থেকে জল বিয়োগ করতে হয়। আমরা আহারকে 'জলযোগ' করা বলে থাকি, এখন দেখা যাচ্ছে যে, পরিপাকটাই জলযোগের আরো প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পূর্বে বলা হয়েছে যে, শ্বেতসারের জারক শ্বেতসারকে দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত করে। তৈলের জারক তেমনি তৈলকে কতকগুলি জৈব অম্ল ও গ্লিসারিনে পরিণত করে। আবার প্রোটীনের জারক মাছ দুধ মাংস ইত্যাদির জটিল অণুগুলি ভেঙে ২০ প্রকার সরলতর

অ্যামিনো- অ্যাসিডে পরিণত করে। এই ভাবে বিশ্লিষ্ট অণুগুলি আবার শরীরের বিভিন্ন অংশে পুনঃসংশ্লিষ্ট হয়ে গ্লাইকোজেন আকারে যকৃতে, বা চর্বির আকারে নানা স্থানে এবং প্রোটীনের আকারে নানা কোষে আবির্ভূত হয়। এই প্রকারে জারকরসেরই ক্রিয়ায় ভাত ডাল ও মাছ থেকে রক্ত মাংস মজ্জা ইত্যাদির উদ্ভব হয়।

খাদ্যের পরিপাক কিভাবে ঘটে বুঝতে হলে পরিপাকযন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়া একটু আলোচনা করা দরকার। আহার প্রথমে দন্তে চর্বিত ও পেষিত হয়ে মুখের বিভিন্ন গ্রন্থি-নিঃসৃত লালার সঙ্গে মিলিত হয়। এই লালায় অবস্থিত টায়ালিন নামক জারক শ্বেতসারকে শর্করায় পরিণত করে—অবশ্য যদি খুব তাড়াতাড়ি চর্বণক্রিয়া শেষ না হয়। মুখ থেকে কতক তরল খাদ্য পাকস্থলীতে পৌছলে বিশেষ গ্রন্থি থেকে লবণাম্ল এবং পেপসিন নামক পাচকরস নিঃসৃত হয়ে তার সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে টায়ালিনের ক্রিয়া স্থগিত থাকে আর খাদ্যের প্রোটীন পেপটোন নামক অপেক্ষাকৃত সরলবস্তুতে পরিণত হয়। তারপর পাকস্থলীর পেশীর নিয়মমত সংকোচনে রসমিশ্রিত তরল খাদ্য অল্পে অল্পে ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌছয়। সেখানের মৃদু ক্ষাররসের ক্রিয়ায় পেপসিনের কাজ বন্ধ হয়। তার বদলে যকৃৎ-নিঃসৃত পিত্তরস এবং অন্ত্রাশয়-নিঃসৃত জারকরসের সঙ্গে তার যোগ ঘটে। পিত্ত খাদ্যের তৈলজাতীয় অংশকে পাচকরসের সঙ্গে মিশ্রিত হতে সাহায্য করে এবং তার ফলে পাচকরস-মিশ্রিত খাদ্য দুধের মতো আকার ধারণ করে। আবার অন্ত্রাশয় এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের নিজের জারক-রসের ক্রিয়ায় শ্বেতসার শর্করায় এবং প্রোটীন এমিনো-অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই পরিপাক-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্রের পরতে পরতে যে শোষক কোষশ্রেণী থাকে তাদেরও ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সুতরাং পরিপাক ও শোষণ একসঙ্গেই চলতে থাকে। এইখানে কিন্তু জারিত শ্বেতসার এবং

প্রোটীন অন্ত্রের চতুষ্পার্শ্বস্থ এক প্রণালী অবলম্বন ক'রে রক্তের, এবং জারিত তৈল অন্য প্রাণালী অবলম্বন ক'রে রসের (lymph) কৈশিক নালীতে প্রবেশ করে। পরে এই প্রথম জাতীয় খাদ্যাংশগুলি যকৃতের ভিতর এবং দ্বিতীয় জাতীয় খাদ্যাংশগুলি গলার কাছে একটা ধমনীতে প্রবেশ করে। খাদ্যের পরিপাচ্য অংশের অধিককাংশই এই ভাবে রক্তে চালিত হয় এবং অপরিপাচ্য বা দুষ্পরিপাচ্য অংশ বৃহদন্ত্রে চালিত হয়। এইখানে খাদ্যের জলীয় অংশ শোষিত হয় এবং পরিপাকের অবশিষ্ট কার্য শেষ হয়। জল কমে যাওয়ায় তরল খাদ্য কতকটা কঠিন হয় এবং পিত্তে নিঃসৃত রক্ত হতে জাত বর্ণবস্তুর সংযোগে মলের আকার ও বর্ণ ধারণ ক'রে মলাশয়ে সঞ্চিত হয়।

রক্ত যেমন একদিকে শরীরের বিভিন্ন তন্তু ও কোষকে এইভাবে পরিপক্ব খাদ্যাংশগুলি দান করে তেমনি এদের উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য বায়ুর অক্সিজেন গ্যাসও লোহিত কণিকার সাহায্যে এনে দেয়। তা ছাড়া তন্তু ও কোষের রাসায়নিক ক্রিয়াসমষ্টিতে উৎপন্ন পরিত্যক্ত বস্তুগুলিকে শ্বাসযন্ত্র মূত্রযন্ত্র ও ত্বকের ঘর্মগ্রন্থির সাহায্যে শরীর থেকে নির্গত করে।

ঘোড়া কুকুর শূকর প্রভৃতির পরিপাকযন্ত্র অনেকটা মানুষের পরিপাকযন্ত্রের মতোই কাজ করে। গরু, মহিষ প্রভৃতি রোমন্থক জন্তুর পাকস্থলী ঘাস পাতা প্রভৃতি সেলুলোজ-প্রধান স্থূল খাদ্যপরিপাকের জন্য কতকটা অন্যভাবে গঠিত। এদের পাকস্থলী চারটি থলিতে বিভক্ত। প্রথমটি সব চেয়ে বড়ো এবং অর্ধচর্বিত ঘাস প্রভৃতি প্রথমে সেখানেই সঞ্চিত হয়। এখানে সেলুলোজ-অংশ কতকগুলি জীবাণুর ক্রিয়ায় পরিপাক হতে থাকে। জাবর কাটার সময় এই থলি থেকে কিছু কিছু লালা-মিশ্রিত খাদ্য মুখে উঠে আসে। সেগুলি দ্বিতীয়বার চিবানোর পরে

আরো বেশি লালার সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রথমটির চেয়ে অনেক ছোটো তৃতীয় কন্দরে বা থলিতে প্রবেশ করে। তবে চর্বিত খাদ্যের কিয়দঅংশ আবার প্রথম থলিতে ফিরে যায়। তৃতীয় থলিতে লালামিশ্রিত খাদ্য পাকস্থলীর পেশীর সংকোচনে অধিকতর পিষ্ট ও তরল হয় এবং ক্রমশ চতুর্থ থলিতে প্রবেশ করে। এইখানেই পরিপাকক্রিয়া ঠিকভাবে আরম্ভ হয় এবং প্রোটীনজাতীয় বস্তুর আংশিক পরিপাক ঘটে। তার পরে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রে পরিপাক মানুষের শরীরের মতোই চলতে থাকে।

এখন দেখা যাক খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে দেহের কার্যশক্তির কী সম্বন্ধ। এই শক্তির পরিমাণ করা যায় ক্যালরি (calorie) নামক এককের সাহায্যে। এক কিলোগ্রাম (প্রায় একসের) জলের তাপ-মাত্রাকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বাড়াতে যে-তাপশক্তির প্রয়োজন তাই এক ক্যালরি। এই শক্তি আবার মোটামুটি ৪২৫ সের ওজনের বস্তুকে ১ মিটার (৩৯″ ইঞ্চি) উর্ধ্বে তুলতে পারে। অর্থাৎ তাপশক্তি ও কার্যশক্তি পরস্পরে রূপান্তরিত করা যায়। এক মন কয়লা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে। তা থেকে তার কার্যশক্তি হিসাব করা যায়। ইংলণ্ডে কয়লার গ্যাসও তাপ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এক লক্ষ পাউণ্ড জলের অল্পমাত্রা এক ডিগ্রী ফারেনহাইট তুলতে যে পরিমাণ গ্যাস পোড়াতে হয় তাকে বলে থার্ম (therm)। এক থার্ম ২৫২ ক্যালরির সমান। এই ভাবে আমরা খাদ্যের তাপ-উৎপাদিকা-শক্তি থেকে তার কার্যশক্তি দেবার ক্ষমতা কত তা বার করতে পারি। তাপ-উৎপাদিকা-শক্তি ক্যালরিমিটর নামক বিশেষ যন্ত্রে নির্ধারণ করা যায়। অবশ্য কয়লার বেলায় যেমন সেটা পোড়ালেই কাজে লাগে, খাদ্যের উৎপাদন কিন্তু পুড়লেই কার্যকর হয় না। কাঠকয়লা শুধু পোড়ালে তাপ জন্মে বলে তাকে খাদ্য-শ্রেণীতে ফেলা যায় না। তেমনি

ঘাস খড় ভুষি তুলা পাট কাঠ ইত্যাদি উদ্ভিজ্জবস্তু দাহ্য হলেও খাদ্য নয়, কারণ সেগুলি সাধারণ প্রাণীর অন্ত্রে পরিপাক হয় না। খাদ্যের শক্তিমূল্য অর্থাৎ সে কতটা শক্তি দিতে পারে তার হিসাব করতে তার অপাচ্য এবং অব্যবহার্য অংশকে বাদ দিতে হবে। যেমন প্রাণীর শরীরে খাদ্যস্থ সেলুলোজ অংশ। অবার খাদ্যের যে অংশের দাহন শরীরে সম্পূর্ণ হয় না তাও আংশিক ভাবে বাদ দিতে হবে। শ্বেতসার বা শর্করা দেহে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার হবার পর তা থেকে জল এবং কার্বনিক-অ্যাসিড গ্যাস অবশিষ্ট থাকে। এগুলি পোড়ালেও তাই হয়। সুতরাং এই বস্তুগুলি শরীরে সম্পূর্ণ ভাবেই কাজে লাগে বলতে হবে। কিন্তু প্রোটীনের পরিপাক ও শোধনের পর তন্তুতে তার রূপান্তর হবার পর যে যে অবশেষ শরীর থেকে নির্গত হয় তা হচ্ছে ইউরিয়া ইউরিক-অ্যাসিড ইত্যাদি জটিল পদার্থ জল কার্বনিক অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়া নয়। অর্থাৎ প্রোটীন পোড়ালে তা যত সরল অবশেষে পরিণত হয় শরীরে ততদূর সরল অবস্থায় পৌছয় না। সুতরাং শরীর প্রোটীনের সম্পূর্ণ শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে না। উদ্ভিজ্জাশী জন্তুর অন্ত্রে অবস্থিত কতক জীবাণু আবার শ্বেতসার, সেলুলোজ ইত্যাদি থেকে কতক পরিমাণ মিথেন নামক গ্যাস উৎপাদন করে। মিথেন উৎকৃষ্ট দাহ্য হওয়াতে শক্তিবস্তুর কতক অংশ এই আকারে অপচিত হয়। এই পরিমাণ শক্তি-মূল্যও (energy value) খাদ্যে গৃহীত শর্করা বা শ্বেতসারের শক্তি-মূল্য থেকে বাদ দিতে হবে। তৈল বা চর্বি যে শক্তিস্থজনে উচ্চস্থানীয় তা আগেই বলা হয়েছে। মোটামুটি ভাবে এক গ্রাম শর্করা বা শ্বেতসার থেকে ৪·১ ক্যালরি তাপ বা শক্তি পাওয়া যেতে পারে (অবশ্য যদি মিথেন ইত্যাদির উদ্ভব না ঘটে)। মিথেন বাদ দিলে শক্তির পরিমাণ মাত্র ৩·৭ ক্যালরি হয়। এক গ্রাম চর্বি বা তৈল থেকে ৯ ক্যালরি

তাপ বা শক্তি জন্মাতে পারে, তবে সব তৈল বা চর্বি সমানভাবে কাজে লাগে না। ১ গ্রাম প্রোটীন থেকে ৫'৮ ক্যালরি শক্তি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু ইউরিয়া ইত্যাদির আকারে মূত্রের সঙ্গে শক্তিবস্তুর অপচয় ঘটাতে মোট ৪'৭ ক্যালরি মাত্র আদায় হয়।

এই উপলক্ষে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, দাহ্যবস্তু থেকে তাপ এবং তাপ থেকে কার্য পাওয়া সম্ভব হলেও মানুষ এ পর্যন্ত এমন কোনো যন্ত্র তৈরি করতে পারে নি যাতে দাহের সমস্ত তাপশক্তি কার্য-শক্তিতে পরিণত হতে পারে। খুব ভালো স্টীম-এঞ্জিনও কয়লা থেকে প্রাপ্ত শক্তির মাত্র ১/৬ অংশ গতিশক্তিতে পরিণত করে। বাকি অংশ নিম্নশক্তি তাপের আকারেই নষ্ট হয়। একটি ঘোড়াও তার খাদ্যে অবস্থিত শক্তির ১/৪ বা ১/৩ অংশ কার্যশক্তিতে প্রকাশ করতে পারে। তবে এই শক্তির কতক অংশ ঘোড়ার নিজের নানা প্রয়োজনীয় অঙ্গ-সঞ্চালনে (ফুসফুস পাকযন্ত্র লেজ পা ইত্যাদি) ব্যয়িত হয়। সুতরাং তাকে স্টীম-এঞ্জিনের চেয়ে উৎকৃষ্ট যন্ত্র বলা যায় না। এ সম্বন্ধে আর বেশি আলোচনা এই পুস্তকে সম্ভব নয়।

গত ২৫ বৎসরের মধ্যে পালিত পশু সম্বন্ধে নানা পরীক্ষণের ফলে বিভিন্ন খাদ্যতৃণ ও খাদ্যশস্যের এবং নানাবিধ খোল জাতীয় খাদ্যের পরিপাচ্য অংশ, তাদের শক্তিদানের ক্ষমতা, বিভিন্ন জন্তুর পোষণ বর্ধন ও দুগ্ধ-উৎপাদনে তাদের মূল্য ইত্যাদি তথ্য সযত্নে নির্ধারণ করা হয়েছে। রসায়ন এবং শারীরবিদ্যাঘটিত এই সব গবেষণার জ্ঞান কাজে লাগানোর ফলে ইউরোপ ও আমেরিকায় পশুপালন ব্যবসায় উত্তরোত্তর উন্নত ও লাভজনক হচ্ছে। এই সব দেশের পশুর সবল কর্মঠ দীর্ঘ এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ দেখলে চোখের তৃপ্তি হয়। তার পরিবর্তে আমাদের দেশের গো-মহিষের শীর্ণ দুর্বল অপুষ্ট এবং রুগ্ন দেহ

দেখলে চোখে জল আসে। এর কারণ আমাদের দেশের তথাকথিত 'পালিত' পশুদের উপযুক্ত আহার কী এবং কী তার পরিমাণ তা কেউ নির্ধারণ করে নি। গতানুগতিক পন্থায় পশুপালন চলে আসছে। সম্প্রতি ইজ্জতনগর কুন্নুর বাঙ্গালোর আনন্দ প্রভৃতি স্থানে সরকারী প্রাণী-পোষণ-গবেষণাগারে এই সব বিষয়ে পরীক্ষা চলছে। আশা করা যায় এই সব পরীক্ষার ফলে দেশের পালিত পশুদের স্বাস্থ্য কিছু ভালো হবে। তবে শুধু উপযুক্ত খাদ্যের নাম জানালেই কোনো কাজ হবে না। সারা দেশের পালিত পশুর খাদ্যতৃণ খাদ্যশস্য খোল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মাবার ব্যবস্থা করলে তবে কিছু ভালো ফল ফলবে।

পালিত পশুদের সম্বন্ধে যা প্রযোজ্য মানুষের বেলা তা আরো বেশি মাত্রায় প্রযোজ্য। অর্থাৎ মানুষের খাদ্য পরিমাণে ও প্রকারে উপযুক্ত না হলে তার শরীররক্ষা হয় না বা কার্যশক্তির উপযুক্ত বিকাশ হয় না। ইউরোপ এবং আমেরিকায় এ সম্বন্ধে প্রচুর পরীক্ষা ও গবেষণা হয়েছে। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ বিবিধ খাদ্যবস্তুর পরিপাচ্য অংশ, পরিপাচ্যতা, তাদের শক্তি ও পুষ্টিদানের ক্ষমতা, তাদের মধ্যে ভাইটামিন ও খনিজের প্রাচুর্য ইত্যাদি বহুযত্নে নির্ণয় করা হয়েছে। সকল অবস্থার এবং সকল ঋতুর উপযুক্ত অল্পব্যয়সাধ্য আহার্য-তালিকাও প্রস্তুত করা হয়েছে। শুধু তালিকা নয় এই তালিকা অনুসারে মানুষকে খাইয়ে তাদের স্বাস্থ্য বল ও রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা অভাবনীয় পরিমাণে বাড়ানো গিয়েছে। গত পঞ্চাশ বৎসরে ইংলণ্ড জার্মানি আমেরিকা ও জাপান ইত্যাদি দেশে লোকের পরমায়ু প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমেছে। দেখা গিয়েছে যে, স্বাস্থ্যের জন্য অস্বাভাবিক কিছু খাওয়া বা করার আবশ্যক নেই। নির্বাচিত আহারের উপযুক্ত পরিমাণ পেলে এবং মুক্ত হাওয়া রোদ ইত্যাদির অভাব না হলে কোনো

চিন্তার কারণ থাকে না। ভাইটামিন ও খনিজ বস্তর যেগুলি আমাদের আবশ্যক তা সবই সহজলভ্য উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ খাদ্য থেকেই আমরা পেতে পারি। বিশেষত দুধ সবজি ও ফল উপযুক্ত মাত্রায় খেলে এগুলির প্রায়ই অভাব ঘটে না।

প্রাণীর পোষণে ভাইটামিন 'এ' 'ডি' ও 'ই' বিশেষ উপযোগী। 'এ' সাধারণত প্রাণীর চর্বিতে দুধে এবং বিশেষ মাত্রায় কয়েক জাতীয় মাছের (কড হাঙ্গর মৃগেল তিমি) যকৃতের তৈলে এবং মাংসে থাকে। এর প্রধান কার্য শরীরের বৃদ্ধিতে সাহায্য করা এবং চক্ষু-রোগ নিবারণ করা। এর অভাবে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং নানারকম চক্ষুরোগ দেখা যায়। ঘাস গাজর ও সবজিতে এর কিছু থাকে। গাজর ইত্যাদির রঙের সঙ্গে এর বিশেষ সম্বন্ধ এবং ওই রং থেকেই এর উদ্ভব। এই ভাইটামিন সবজি থেকে প্রাণীর যকৃতে ও দুধে এবং দুধ থেকে মাখনে সঞ্চারিত হয়। ভাইটামিন 'ডি' ও 'এ'-র সঙ্গে চবি ও যকৃত-তৈলে থাকে, কিন্তু সবজিতে থাকে না। এর কার্য 'রিকেট' নামক অস্থি ও দন্তরোগ নিবারণ করা। আর্গোস্টেরল নামক বস্তু থেকে সূর্যালোকের সাহায্যে এর উদ্ভব হয়। এই বস্তু কোনো কোনো উদ্ভিজ্জ তৈলে (red palm oil) এবং "ইস্ট" (yeast) নামক জীবাণু-ঘটিত বস্তুতে বর্তমান থাকে। ভাইটামিন 'ই' সাধারণত উদ্ভিজ্জ তৈলে এবং গমের অঙ্কুরে থাকে। এর কার্য প্রাণীদের সন্তান-উৎপাদিকা শক্তি দেওয়া। এ ছাড়া কতকগুলি বিশেষ রোগ-নিবারণের জন্য 'বি' ও 'সি' দরকার হয়। 'সি' সাধারণত লেবু জাতীয় ফলের রসে ও টাটকা সবজিতে থাকে। এর প্রধান কাজ "স্কার্ভি" নামক চর্মরোগ নিবারণ করা, এ ছাড়া অন্য রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও এর থেকে পাওয়া যায়। ভাইটামিন 'বি'. বেরিবেরি এবং এই জাতীয় স্নায়ুঘটিত রোগ নিবারণ

করে। টাটকা সবজিতে এবং মুগ ছোলা ইত্যাদি বীজের অঙ্কুরে এই ভাইটামিন থাকে। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ আহার্যের মধ্যেই আমাদের আবশ্যক সব উপাদান আছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, অধিক তাপ এবং বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে ক্রিয়ার ফলে কতকগুলি ভাইটামিন নষ্ট হয়, সুতরং পাককার্য একটু সাবধানে করা দরকার এবং কোনো কোনো আহার্য টাটকা অবস্থায়ই (না রেঁধে) খেতে হয়। এ ছাড়া সূর্যালোকের ব্যবহারও ক্লেশসাধ্য নয়। এই উপলক্ষ্যে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের উপকারিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পালিত পশু ও মানুষের খাদ্য-বিষয়ক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, অন্য খাদ্যের সঙ্গে অল্প কিছু দুধ মাখন-তোলা দুধ বা ঘোল দিলে অনেক ভালো ফল পাওয়া যায়। বিশেষত শিশুর বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে দুধের মূল্য অত্যধিক। কোনো কোনো জন্তুকে দুধের বদলে মাছের মাংসের গুঁড়া, কডলিভার তৈল বা মাংসের গুঁড়া দিলেও এই কাজ হতে পারে। অল্পপরিমাণ টাটকা সবুজ তরকারি বা সবজিও নানারকম চর্মরোগ আশ্চর্যভাবে নিবারণ করে।

শরীরধারণের উপযুক্ত খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে নানা পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দিনে ৩০০০ ক্যালরি পরিমাণ শক্তির দরকার। খাদ্যে অপাচ্য অংশ থাকাতে ৩৪০০ ক্যালরি শক্তির উপযুক্ত খাদ্য তার দরকার হয়। তবে যারা গুরুতর শ্রম করে তাদের এই জায়গায় ৬০০০ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্য দরকার। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের শতকরা ৮৬ ভাগ খাদ্য দরকার। বালক ও তরুণের বেলা শরীরের ওজনের অনুপাতে প্রাপ্তবয়স্ক সাধারণ পুরুষের চেয়ে বেশি খাদ্যের দরকার, কারণ তাদের শরীর বর্ধনশীল এবং অবিরত অঙ্গচালনার ফলে শক্তির ক্ষয়ও তাদের বেশি। পুরুষের ৩০০০ ক্যালরির

মধ্যে প্রায় ৩ কাঁচ্চা (৪০ গ্রাম) উৎকৃষ্ট ধরনের প্রোটীন অথবা দেড় ছটাক সাধারণ মিশ্রিত প্রোটীন দরকার হয়। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বা দরিদ্র পরিবারে এই পরিমাণ শক্তিবস্তু জোটে না, প্রোটীন তো নয়ই। এই কারণে আমাদের শরীর দুর্বল, শ্রমকাতর ও রোগপ্রবণ। তা ছাড়া পাকপ্রণালীর দোষে খাদ্যের কতক অংশ গুরুপাক ও কতক অংশ ভাইটামিন-বিযুক্ত হয়। টাটকা সবজী আহারের অভ্যাস না থাকাতেও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। তবে এই সব দোষ সংশোধন করা মোটেই শক্ত নয়। শুধু কোনো কোনো খাদ্যের, বিশেষত ফল দুধ ও প্রাণীজ খাদ্যের, পরিমাণ বৃদ্ধি করা ব্যয়সাপেক্ষ বলে সাধারণের ক্ষমতাধীন নয়।

খাদ্যের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হল, এখন দেখা যাক খাদ্যের উৎপাদনে রসায়নের কী প্রয়োগ থাকতে পারে। খাদ্যের উৎপাদন ও বর্ধন করতে হলে উপযুক্ত কৃষির আবশ্যক। কৃষিকার্য আবার সার্থকভাবে করতে গেলে জমির গুণাগুণ ও তার চাষের উপযোগিতা জানা দরকার। নানা রাসায়নিক বিশ্লেষণে জমির প্রকৃতি, উপাদান এবং তাতে সারবস্তুর অভাব বা সদ্ভাবের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়। এ ছাড়া অবশ্য চাষ, নিড়ান, জল ও সারের উপযুক্ত ব্যবস্থা, বীজ নির্বাচন, আগাছা নাশ এবং কীটপতঙ্গ ও নানা শস্যশত্রুর নিবারণ, এসবও খুব দরকার। এই সব ব্যাপারেই রসায়নের সহায়তা আবশ্যক এবং অধিকাংশ দেশেই রসায়নের জ্ঞান এই সব কাজে লাগানোর ফলে কৃষিশিল্প যথেষ্ট লাভবান হয়েছে। প্রত্যেক শস্যের জন্য যে বিশেষ ধরনের জমি আবশ্যক তা সকলেই জানেন। ধানের জমিতে কাপাস বা পাটের জমিতে আখ ভালো হয় না। তা ছাড়া কোন্ মাটিতে কী কী শস্যের উপযুক্ত সার আছে বা কোন্ বস্তু দিলে এই সারের অভাব দূর হয় তা জানা

২

প্রথমেই দরকার। প্রাণীর মলমূত্র, পচা পাতা ও নানাবিধ গলিত উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ বস্তুর উপযুক্ত ব্যবহারে খুবই ভালো ফল পাওয়া যায়। এই জাতীয় সার তৈরি করার প্রক্রিয়া নানা দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে। সাধারণত এই সব বস্তু স্তূপাকার ক'রে বা গর্তের মধ্যে জমা ক'রে রাখলে নানাজাতীয় উদ্ভিজ্জাণুর সাহায্যে এগুলি আপনিই ঝরঝরে গন্ধহীন কালো বা কটা রঙের যে বস্তুতে পরিণত হয় তাকেই পাতাসার (humus) বলে। এ ছাড়া স্বাভাবিক ও কৃত্রিম নানা খনিজ বস্তু জমির সার হিসাবে ইউরোপ, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। প্রধানত গাছের খাদ্য হিসাবে জমিতে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, নাইট্রোজেন এবং পটাশ ঘটিত খনিজের দরকার, এ ছাড়া আরো কতকগুলি খনিজ অল্প মাত্রায় থাকা দরকার। যেমন লৌহ, ম্যাগনিসিয়াম, বোরন, ম্যাঙ্গানিজ, ফ্লয়োরিন আয়োডিন ইত্যাদি। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস হাড় বা হাড়ের গুঁড়ার আকারে অথবা সুপারফসফেট নামক কৃত্রিম খনিজের আকারে দেওয়া যায়। আবার নাইট্রোজেন গরুর চোনা, পক্ষী ও সরীসৃপের মল, সোরা বা চিলি দেশীয় সোরার আকারে কিংবা কৃত্রিম-ভাবে প্রস্তুত অ্যামোনিয়াম সালফেট, নিসিফস, সায়ানএমাইড ইত্যাদির আকারে দেওয়া যায়। পটাশ সোরার উপাদান হিসাবে সোরার সঙ্গে বা জার্মানির খনি থেকে উৎপন্ন কতকগুলি খনিজের আকারে দেওয়া যায়। চুনও ক্যালসিয়ামেরই যৌগিক। ক্যালসিয়াম সরবরাহ ছাড়া চুনের জমির স্বাভাবিক ও কৃত্রিম অম্লদোষ দূর করার বিশেষ ক্ষমতা থাকাতে অনেক জমিতে তা বিশেষ ফলদায়ক হয়। এই সব খনিজ সার কিভাবে কী পরিমাণে এবং চাষের কোন্ সময়ে দিলে ভালো হয় এ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণার ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশে কৃষির অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। আমাদের দৈন্যগ্রস্ত কৃষক এগুলির উপকারিতা জানে না বা জানলেও

টাকার অভাবে এগুলি কাজে লাগাতে পারে না। তাছাড়া অন্য দেশের মতো এদেশে এগুলির প্রস্তুতি এখনো তেমন ভাবে আরম্ভ হয়নি। আবার মটর, সীম, কলাই, ধঞ্চে ইত্যাদি লাগালেও যে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে তা অনেকেই জানেন। এই সকল গাছের মূলে গ্রন্থির আকারে কতকগুলি স্থূল অংশে B. Radicicola নামক একজাতীয় উদ্ভিজ্জাণু থাকে। তারা বাতাসের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস দুটির মিলন ঘটিয়ে নাইট্রেট বা সোরা জাতীয় বস্তু ও পরে প্রোটীন জাতীয় বস্তুর সৃষ্টি করে। গাছগুলি মরলে সেই প্রোটীন আবার মাটিতে গাছের ব্যবহার্য নাইট্রোজেন ঘটিত সারে পরিণত হয়। সার সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য এই গ্রন্থমালার অন্য পুস্তিকায় ('জমি ও চাষ') বিশেষ ভাবে বিবৃত হয়েছে, সুতরাং এখানে আর সবিস্তারে আলোচনার আবশ্যক নেই।

শস্যের শত্রুনিবারণে রসায়নের ব্যবহার আলোচনা করা যাক। শস্যের শত্রু নানা রকম হতে পারে এবং তারা অবস্থা ও সুযোগ অনুসারে শস্যের অল্প বা বিস্তর ক্ষতি করতে পারে। ব্যাঙের ছাতা বা ছত্রক (Fungus) জাতীয় ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জাণু পাতা, মূল, ডাঁটা ও ফলের উপর জন্মে। প্রথমে এই সব অঙ্গের বিশেষ বিকার দেখা যায় না, কিন্তু অল্প সময়েই হয় এগুলি শুকিয়ে মরে বা পচে যায়, না হয় তাতে নানা রঙের দাগ পড়ে। তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি থেমে যায় এবং ফলে বীজ ক্রমশ দুর্গন্ধ, দাগী ও অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। এইভাবে নানা রকম শত্রু সকল রকম শস্যেরই ক্ষতি করতে পারে। ধান, যব, গম ও ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে তিন প্রকার উদ্ভিজ্জাণুর প্রকোপ প্রধান। এদের কেউ জীবন্ত গাছে, আর কেউ রুগ্ন বা ক্ষয়প্রাপ্ত গাছেই বাস করে। যব, গম ইত্যাদি শস্যের নানা অংশে "স্মাট" নামক একপ্রকার উদ্ভিজ্জাণু জন্মে। শস্যের শিষেই এর অবস্থান প্রকট হয়। শিষের দানাগুলি প্রথমে কটা ও পরে কালো হয়ে অবশেষে

একেবারে কালো রঙের ধুলা বা কয়লার গুঁড়ার মতো বস্তুতে পরিণত হয়। এই বস্তু ওই উদ্ভিজ্জাণুর বীজ বা spore। হাওয়া লাগলে এইগুলি উড়ে গাছের সুস্থ অংশে বা অন্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে ও অতি অল্প সময়ে সেগুলিকে রোগগ্রস্ত ও বিনষ্ট করে ফেলে। এই সব রোগবীজ শস্যের বীজে অল্পপরিমাণেও লেগে থাকলে পর-বৎসর মাটিতে বপনের পর নূতন গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে এই পরগাছা উদ্ভিদও বাড়তে থাকে এবং শিষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিষকে আক্রমণ করে। এইভাবে বছরের পর বছর শস্য নষ্ট করতে থাকে। "রাস্ট" নামক আর-একপ্রকার উদ্ভিজ্জাণু এইভাবে গম প্রভৃতি শস্যের শিষে লাল বা কটা রঙের গুঁড়ার আকারে প্রকট হয় এবং একই ভাবে গমের প্রভূত ক্ষতি করে। এর জীবনলীলার এক অংশ গম ছাড়া অন্যজাতীয় গাছে (barberry ইত্যাদি জংলি গাছে) পর-গাছার আকারে কাটে। পরে গমের সময় আবার সেখান থেকে গমের চারায় সঞ্চারিত হওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা ঘটে। এই দুই জীবাণু রোগগ্রস্ত শিষগুলি পোড়ালে তবে নষ্ট হতে পারে। কিন্তু বড়ো বড়ো চাষের খেতে এরকম করে শিষ সংগ্রহ করা কঠিন নয়। সুতরাং রাসায়নিক বস্তুর প্রয়োগে সংক্রামিত বীজগুলিকে রোগবীজমুক্ত করা হয়। দেখা গেছে যে বীজগুলি ৫ মিনিটকাল ৫৫ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রার জলে রেখে পরে ঠাণ্ডা জলে ঠাণ্ডা করে মেঝেতে একদিন বিছিয়ে রাখলে এই স্মাট-এর স্পোর-গুলি নষ্ট হয়। অথবা তুঁতের পাতলা দ্রাবণে বীচগুলি ভিজিয়ে পরে শুকিয়ে রাখলেও এই কাজ হয়! তুঁতের বদলে ফর্মালিনের দ্রাবণও ব্যবহার করা চলে। রাস্ট-এর স্পোর নিবারণ করতে কিন্তু এসব প্রক্রিয়া বিশেষ কার্যকর হয় না। তবে অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে জমিতে নাইট্রোজেন-ঘটিত সারের প্রয়োগ বেশি হলে বা জমি বেশি স্যাঁতসেঁতে থাকলে এই রোগের প্রকোপ বেশি হয়। তাছাড়া

barberry জাতীয় এদের আশ্রয়-বৃক্ষগুলিকে পুড়িয়ে ধ্বংস করাও নূতন আক্রমণ নিবারণের এক উপায়। "আরগট" নামক আর-একপ্রকার উদ্ভিজ্জাণু গম ইত্যাদি অনেক শস্যতৃণে এবং ঘাসে জন্মে তাদের শিষ আক্রমণ করে। তার ফলে বীজগুলি দেখতে কালো ও শক্ত হয়ে পড়ে কিন্তু ভিতরে সাদা দাগ থাকে। কালো দাগ দেখলে বীজ এমন কি শিষগুলি পর্যন্ত পোড়ানো দরকার। মাটি স্যাঁতসেঁতে থাকলে এই রোগের প্রকোপ বাড়ে।

আলুগাছেও নানা রকম রোগ হতে পারে। এক প্রকার উদ্ভিজ্জাণুর আক্রমণে আলুর পাতা ও ডালপালা ক্রমশ বৃদ্ধিহীন এবং স্বাস্থ্যহীন হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মাটির ভিতরে আলুরও বৃদ্ধি শেষ হয়। ভূমি স্যাঁতসেঁতে থাকলে বা বেশি বৃষ্টি হলে এর প্রকোপ বেশি হয়। দেখা গেছে যে নাইট্রোজেন-ঘটিত সার কিছু কমিয়ে পটাশ ও ফসফরাস-ঘটিত সার বাড়ালে এর কতক নিবারণ হয়। তাছাড়া তুঁতের জলে বীজ-আলুর টুকরাগুলি ভিজিয়ে পরে লাগালেও কতক উপকার পাওয়া যায়। গাছে তুঁতে ও চুনের জল একত্র মিশিয়ে তৈরি বোর্দো মিক্‌চার পিচকারির সাহায্যে বার বার ছিটলেও এর প্রতিবিধান হয়। এই বোর্দো মিকচার অনেক জাতীয় উদ্ভিদ-জীবাণু নষ্ট করে বলে চাষার বিশেষ কাজে আসে। পাতা, ফল, ফুল ইত্যাদি সবেই এই ঔষধ লাগানো চলে। এ ছাড়া জমিতে কাঁকর, ছাই ইত্যাদির পরিমাণ বেশি থাকলে তার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত আলুর কন্দে নানাজাতীয় রোগ জন্মে। তার ফলে নানা রঙের দাগ হয় এবং এই ক্ষতগুলি নানা উদ্ভিজ্জাণুর আশ্রয় এবং লীলাক্ষেত্র হয়ে পড়ে। তাতে আলুর খাদ্যমূল্য ও বিক্রয় মূল্য অনেক কমে যায়। ফর্মালিনের জলে ডুবিয়ে বীজ-আলু রোপণ করলেও কতক পরিমাণে এই রোগ নিবারণ হয়।

জীবাণু-ঘটিত রোগ ছাড়া নানা জাতীয় কীট-পতঙ্গও খাদ্যশস্যের অনেক ক্ষতি করে। পোকার আক্রমণ নিবারণের জন্য তামাকের জল, ছাই ইত্যাদির ব্যবহার আছে। এ ছাড়া নানা রকম স্বভাবজ ও কৃত্রিম বস্তু গুঁড়া, দ্রাবণ, ধোঁয়া ইত্যাদির আকারে পিচকারিজাতীয় বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ফুলে, ফলে বা পাতায় লাগালে এর প্রতিরোধ হতে পারে। পাশ্চাত্ত্য দেশে এই সব অপচয়কারী পোকা-মাকড়ের জীবনলীলার ইতিহাস অতি সযত্নে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং তাদের ও শস্যের জীবনের কোন্ অবস্থায় ঔষধের প্রয়োগে ফল ভালো হয় তা জানা গিয়েছে। তামা ও আর্সেনিক ঘটিত নানা কৃত্রিম জৈব ও অজৈব বস্তুর ব্যবহারের ফলে ওই সব দেশে শস্যরক্ষার ব্যবস্থা অনেকটা সহজ হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশেও নানা সরকারী গবেষণাগারে পরীক্ষা চলছে।

নানা জাতীয় পাখি ও জন্তু পোকামাকড় নিবারণের কাজে লাগে, সুতরাং এই পাখিদের তাড়ানো ও মেরে ফেলা চাষার পক্ষে হিতকর নয়। পোকা মারার জন্য অন্য পোকার আশ্রয় নেওয়ারও কখনো কখনো দরকার হয়। এই নতুন পোকাগুলি শস্যনাশকারী পোকার শরীর বা ডিমে পরভোজীর মতো বাস ক'রে সেগুলিকে ক্রমশ নষ্ট করে, ফলে শস্যের অপচয় কম হয়। এ সম্বন্ধে যুক্তরাজ্যে অনেক পরীক্ষা হয়েছে।

এখন মানুষ ও পালিত পশুর রোগনিবারণ ও রোগলাঘবে রসায়নের ব্যবহার আলোচনা করা যাক। রোগনিবারণে ও রোগলাঘবে রসায়নের ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। গাছ-গাছড়াকে ঔষধের কাজে লাগানোর কথা ঋগ্বেদে দেখা যায়। সোমরসের অদ্ভুত গুণের কথা এখানেই পাওয়া যায়। অথর্ববেদেও নানা বনজ ঔষধের কথা, বিশেষত মাদুলি ইত্যাদির আকারে তাদের ব্যবহারের কথা লেখা আছে। তবে

প্রধানত আয়ুর্বেদ বা উপবেদেই বহু তরুলতাগুল্মের বিবরণ ও ব্যবহারের উল্লেখ আছে। আয়ুর্বেদই ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তি বলা যায়। এর আট অধ্যায়ে শারীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাবিদ্যার বহু বিষয় বর্ণিত আছে। আয়ুর্বেদ কারোর মতে খ্রীষ্ট-জন্মের ২৫০০ বৎসর, আবার কারোর মতে ৬০০ বৎসর পূর্বে রচিত। এর পর সুশ্রুত ও চরকের সংহিতা লিখিত হয়। সুশ্রুতে অস্ত্রোপচারের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। তবে ভেষজ-চিকিৎসা সম্বন্ধেও একটি বৃহৎ অধ্যায় আছে। চরক প্রায় একই সময়ের লোক। তাঁর পুস্তকে ভেষজ-বিদ্যার স্থান খুব বেশি। দ্বাদশ অধ্যায়ে তিনি তৎকালীন ভৈষজ্যতত্ত্ব অতি যত্নে বিবৃত করেছেন। ঔষধ প্রয়োগের নানা প্রণালী এঁরা খুব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এমন কি সূচি সাহায্যে (injection-এর মতো) ঔষধ প্রয়োগের কথাও এঁরা বর্ণনা করেছেন। চরক এবং সুশ্রুতের সংহিতাই উত্তরকালের অন্য চিকিৎসাপ্রণালীর ভিত্তি। এই সব গ্রন্থ থেকে আমরা সেকালের চিকিৎসার অসামান্য উন্নতির কথা জানতে পারি। ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ভোজপ্রবন্ধে অস্ত্রোপচারের আগে ঘ্রাণের সাহায্যে ঔষধ প্রয়োগের কথা আছে। এটি সম্ভবত anaesthetic জাতীয় বস্তু। বুদ্ধের সময় সম্মোহিনী নামক চেতনালোপকারী ঔষধের ব্যবহার জানা ছিল। এই সময় থেকে মুসলমান আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু আয়ুর্বেদের উন্নতির যুগ। এই যুগের শেষের দিকে ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার যশ মিশর, গ্রীস ও রোমে পৌছে। গ্রীক ও রোমক চিকিৎসাশাস্ত্র ভারতীয় আয়ুর্বেদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই সময়ে উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ এবং খনিজ নানা বস্তুর চিকিৎসায় ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণা হয়েছিল বলেও প্রমাণ আছে। সর্পদংশনের নানা অদ্ভুত চিকিৎসার কথা নানা ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়। পারাসেলসস,
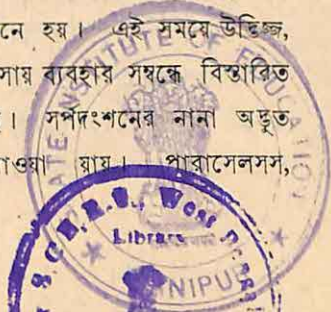
হিপোক্রাটিস এবং পিঠাগোরাস ইত্যাদি গ্রীক দার্শনিকেরা প্রাচ্যে ভ্রমণের পর নিজের দেশে হিন্দু সংস্কৃতির নানা বিশেষ অংশের প্রবর্তন করেন বলে জানা গেছে। ডিওস্‌কোরইডেস Dioscoroides নামক বিখ্যাত গ্রীক বৈদ্য তাঁর গ্রন্থে হিন্দু আয়ুর্বেদের কাছে তাঁর দেশের ঋণ স্বীকার করেছেন। নানা ভারতীয় ঔষধের নাম ও ব্যবহার তাঁর গ্রন্থে আছে। হাঁপরোগে ধুতুরার ধূম, পক্ষাঘাত ও অজীর্ণ রোগে কুচিলা এবং সারক হিসাবে জয়পালের ব্যবহার প্রথমে ভারতেই ঘটে। প্রাচীন ভারতের বহু ভেষজ প্রাচীন রোমে রপ্তানি হত। প্লিনির (Pliny) সময় এই ব্যবসায়ের এত প্রসার হয় যে রোমের বহু স্বর্ণ এভাবে ভারতে চলে যেত বলে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন।

তান্ত্রিক ও সিদ্ধদের যুগের পর হিন্দু আয়ুর্বেদের অধঃপতন হয়। গ্রীক, শক ও মুসলমান আক্রমণের কাল পর্যন্ত এ সম্বন্ধে নূতন গ্রন্থ রচিত হয়নি। ক্রমে এই ব্যবসায় পুরোহিতসম্প্রদায়ের হাতে যায় এবং দ্রব্যগুণের পরিবর্তে মাদুলি ইত্যাদি ধারণ প্রচলিত হয়। তাছাড়া প্রাণীর মৃতদেহ অস্পৃশ্য বলে পরিগণিত হওয়াতে শারীরবিদ্যার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। বুদ্ধের প্রচারিত অহিংসানীতিও সম্ভবত এই ব্যাপারে সাহায্য করে। তবে বৌদ্ধযুগে অস্ত্রোপচার কম হলেও ভেষজবিদ্যার কতকাংশের পুনর্জীবন লাভ হয়। নানা নূতন ভেষজের নাম পূর্বের তালিকায় যোগ করা হয় এবং এই সব ভেষজের চাষ ও সংরক্ষণ চলতে থাকে। বৌদ্ধযুগের পর আয়ুর্বেদের বিশেষ দুর্দিন আসে। মুসলমান আক্রমণের পর স্বভাবতই আরবদেশীয় চিকিৎসানীতির প্রচলন আরম্ভ হয়। অবশ্য এই বিদ্যার প্রয়োগে এবং প্রসারে আরবদের দানও সামান্য ছিল না। পারস্য থেকেও অনেক ভেষজ আরব চিকিৎসাশাস্ত্রে গৃহীত হয়েছে। ভারতে পাঠান ও মোগল সম্রাটদের রাজত্বে আরবী চিকিৎসাই প্রচলিত ছিল।

তবে এই বিদ্যার নূতন কোনো উন্নতি হয়নি। মোগল রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যা অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়। তবে হিন্দু ও আরবী দুই প্রণালী মিলিত হয়ে পরস্পরের কতকটা উন্নতি ঘটায়। পরে পোর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজদের ভারত আগমনকালে এই দুই দেশীয় প্রণালীর অনাদর ঘটতে থাকে।

ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের চিকিৎসা-বিধির প্রচলন আরম্ভ হয়। দেশীয় প্রণালীর অবনতি হওয়াতে এই প্রণালীই তখন কার্যকর হয়। বিশেষত পাশ্চাত্য অস্ত্রোপচার পদ্ধতিতে বহু অদ্ভুত সুফল দেখে দেশের লোক এই প্রণালীর চিকিৎসা সাদরে গ্রহণ করতে থাকে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রসার সত্ত্বেও দেশীয় চিকিৎসা-প্রণালী কোনো সময়েই একেবারে লুপ্ত হয়নি। কারণ পাশ্চাত্য প্রণালী বরাবরই বহুব্যয়সাধ্য। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই প্রভেদ উপলব্ধি করেন এবং দেশী প্রণালীতে চিকিৎসার যথাসম্ভব উৎসাহদান করেন। বর্তমান যুগে আয়ুর্বেদীয় এবং ইউনানী ভেষজগুলির সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এই ভেষজগুলির মধ্যে যেগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে এসেছে সেগুলির গুণাবলী ভালো করে পরীক্ষা করার উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এই সব গাছপালা চেনার, ভৈষজ্য সার নিষ্কাশনের এবং তাদের উপযুক্ত রাসায়নিক নির্ণয়-প্রণালী আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে। এগুলির রাসায়নিক প্রকৃতি ও গঠন নির্ধারণের এবং কৃত্রিম উপায়ে এগুলির উৎপাদনেরও চেষ্টা চলছে।

কলিকাতার 'স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন', 'অল্ ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অব হাইজিন' এবং ভারতীয় নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সম্বন্ধে পরীক্ষা চলছে। তার ফলে জানা গেছে যে, আয়ুর্বেদে-উক্ত সব গাছগাছড়াই

যে উৎকৃষ্ট ফল দেয় তা নয়। কতকগুলি গতানুগতিক ভাবে ব্যবহৃত হলেও বিশেষ কাজে আসে না। তবে অন্যান্য নানা দ্রব্যের সঙ্গে মিশে তাদের মধ্যে নূতন গুণ আবির্ভূত হতে পারে। আর-একটি প্রয়োজনীয় বিষয় জানা গেছে যে, ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে অনুমোদিত নানা ভেষজ উদ্ভিদ বা তাদের নিকট-জ্ঞাতি ভারতে স্বাভাবিক ভাবে জন্মে। এইসব গাছগাছড়া থেকে পাশ্চাত্ত্য ঔষধ সহজেই প্রস্তুত হতে পারে। ভারতের নানা অংশে জলবায়ুর পার্থক্য এত বেশি যে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে ইউরোপের সকল ভৈষজ্যরত্নই এখানে জন্মানো সম্ভব। ভারতীয় গাছগাছড়া বহু বৎসর ধরে ইউরোপে রপ্তানি হচ্ছে এবং এই সব থেকেই নিষ্কাশিত ঔষধ আবার বহুমূল্য বটিকা, চূর্ণ, দ্রাবণ ইত্যাদির আকারে এদেশে ফিরে আসছে। এই যাতায়াতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাম ৫, ১০ বা ২০ গুণ বৃদ্ধি হচ্ছে। ইউরোপীয় ভেষজের মধ্যে কতকগুলি প্রচুরভাবে এদেশে জন্মে, যেমন, বেলেডোনা (belladonna), হায়োসায়ামাস (hyoscyamus), অ্যাকোনাইট (aconite), জুনিপার (juniper), ভ্যালেরিয়ান (valerian), আর্টিমেসিয়া (artamesia), পোডোফাইলাম (podophyllum), সিনকোনা (cinchona), ইত্যাদি। আবার কতকগুলির চাষ অতি সহজেই ভারতে হতে পারে, যেমন ডিজিটালিস (digitalis), ইপিকাক (ipecac), ইউকালিপটাস (eucalyptus), জালাপ (jalap), ইত্যাদি। এর মধ্যে কিছু কিছু চাষ এদেশে উপযুক্ত স্থানে এবং উপযুক্ত জলবায়ুতে আরম্ভ করা হয়েছে। আরো বিস্তৃতভাবে এগুলির চাষ ও নিষ্কাশন করা মোটেই শক্ত হবে না। বহু বৎসর ধরে আমাদের ভেষজের আমদানি-মূল্য রপ্তানি-মূল্যের প্রায় ৫ গুণ হিসাবে চলছে। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে প্রতিবৎসর গড়ে ৩৭ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানি এবং ১৬৬ লক্ষ টাকার

মাল আমদানি হয়েছিল। পরে এই ব্যবসায়ের পরিমাণ আরো বেড়েছে মনে হয়। এই শোচনীয় অবস্থা আমাদের পরমুখাপেক্ষিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ছাড়া আর কী হতে পারে? আমাদের অধিকাংশ গৃহস্থ বা দরিদ্র পরিবার এই সব বহুমূল্য ঔষধের সাহায্যে রোগচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না। যদি এই ভৈষজ্যগুলি এদেশেই প্রস্তুত হত তাহলে তার ব্যবহার সাধারণের অসাধ্য হত না এবং আমাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা আরো অনেক উন্নত হত।

সম্প্রতি-পরীক্ষিত ভারতীয় উদ্ভিজ্জ ভেষজের মধ্যে নিম্নলিখিত-গুলির উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে:—কুষ্ঠরোগে চালমুগরা, পিত্তদোষে কেস্থর, মূত্রবিকারে পুনর্ণবা, আমাশয়ে কুড়চি এবং শিমুল, ম্যালেরিয়ায় ছাতিম, পক্ষাঘাতে ও স্নায়ুরোগে বেড়েলা, কাশরোগে বাসক, ঋতু-রোগে অশোক, হৃদরোগে অর্জুন, বাতে গুল্গুল, কৃমিদোষে পলাশ, আমাশয় ও অজীর্ণে বেল, ইসবগুল ইত্যাদি এবং মৃগীরোগে ব্রাহ্মী। এই সব থেকে উপযুক্ত প্রণালীতে তৈরি ঔষধ অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারেরাও এখন বিধান দিচ্ছেন।

কোনো উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ ঔষধ মানুষের কাজে লাগানোর আগে এখন তাকে রসায়নাগারে পরীক্ষা করে তার উপাদানগুলি নিষ্কাশন এবং নির্ধারণ করা হয়। তারপর তার ভৈষজ্যসারগুলি বিশেষ বিশেষ প্রাণীর শরীরে সুস্থ অবস্থায় এবং রোগের সময় প্রয়োগ ক'রে ওই প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, রক্ত ইত্যাদির উপর তাদের ক্রিয়া ভালোরূপে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এইভাবে সারটি নির্দোষ এবং ফলপ্রদ প্রমাণিত হলে হাসপাতালে দক্ষ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সেটি রোগগ্রস্ত মানুষের উপর প্রয়োগ ক'রে তার ফলাফল লক্ষ্য করা হয় এবং প্রয়োগের মাত্রা নিরূপণ করা হয়। তারপর সেটি সাধারণ রোগীর ব্যবহারে আসে। এই সব

পরীক্ষায় যথেষ্ট সময়, জ্ঞান এবং সযত্ন পর্যবেক্ষণের দরকার হয়। কিন্তু এইভাবে পরীক্ষার পরে ঔষধের উপকারিতা অপকারিতা বা নিষ্ফলতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে যায়। আমাদের দেশের অপর্যাপ্ত ভেষজের মধ্যে অল্প কয়েকটি এইভাবে পরীক্ষিত হয়েছে, আরো যথেষ্ট কাজ বাকি আছে। এই সব ঔষধ আবার সাধারণের কাজে লাগাতে হলে প্রচুর পরিমাণে তার উৎপাদন ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা দরকার। এই কাজ অন্য দেশে প্রচুর ভাবে হয়েছে। আমাদের দেশে গত ২৫ বৎসর ধরে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু চেষ্টা সাফল্যের সঙ্গে চলছে। কিছুদিন আগেও বহু লক্ষ টাকার ঔষধ আমাদেরই দেশের কাঁচা মাল থেকে বিদেশে প্রস্তুত হয়ে আমাদের কাছে ফিরে এসেছে, এখনো আসছে। তাই প্লিনির মতো আমাদেরও আক্ষেপ করতে হয় যে, আমাদের বহু ধনসম্পদ এইভাবে বিদেশে চলে যাচ্ছে। বর্তমান যুদ্ধের আগে প্রতি বৎসরে গুঁড়া চায়ের পাতা যে পরিমাণে নামমাত্র মূল্যে বিদেশে রপ্তানি হয়েছে তা থেকে বৎসরে ৮২ হাজার পাউণ্ড কেফিন তৈরি হয়েছে এবং অন্তত ২ লাখ ৫০ হাজার টাকায় বিক্রীত হয়েছে। ৩২ হাজার টাকা মূল্যে ৫০ হাজার মন কুচিলার বীজ বিদেশ থেকে স্ট্রিক্নিন এবং তদ্‌ঘটিত ঔষধের আকারে ফিরে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকায় বিক্রীত হয়েছে। এইগুলি এবং এইরকম অন্য জিনিস আমাদের দেশে প্রস্তুত হওয়া মোটেই শক্ত নয়। এগুলি দেশে প্রস্তুত না হলে আমাদের দরিদ্র দেশবাসীর রোগ-লাঘবের কোনো আশা নেই।

দেশের গাছগাছড়া থেকে ঔষধ প্রস্তুত করার কাজে সবার অগ্রণী হিসাবে রসায়নী-শ্রেষ্ঠ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম উল্লেখ করা যায়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সময়েই এই বিষয়ে তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তিনি প্রথমে লেবুর রস থেকে ঔষধে ব্যবহৃত

সিট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কলিকাতায় লেবু সস্তা না হওয়ায় বিষয়ান্তরে তাঁকে মনোযোগ দিতে হয়। বটকৃষ্ণ পাল এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদের দোকানে কী কী ঔষধ বেশি পরিমাণে বিক্রয় হয় তার সন্ধান করে তিনি নিজে প্রস্তুতের জন্য কতকগুলি উদ্ভিজ্জ ও খনিজ ঔষধ নির্বাচন করেন। এই সময়ে বিখ্যাত ব্যবসায়ী ডি ওয়াল্ডি তাঁর নিজের ছোটো কারখানায় সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত আরম্ভ করেছিলেন। এই অ্যাসিড থেকে অন্য ব্যবসায়ীরা অল্প পরিমাণে নাইট্রিক ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও প্রস্তুত করেন। এই তিনটি অ্যাসিড যে রসায়ন-শিল্পের ভিত্তিস্বরূপ সে কথা সকলেই জানে। এই সব কারখানার প্রস্তুতপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করে প্রফুল্লচন্দ্র তাদের দোষগুণ বুঝতে পারেন এবং দোষ সংশোধনের উপায়ও বিবেচনা করেন। তারপর সাজিমাটি থেকে সোডা প্রস্তুতের চেষ্টা আরম্ভ হয়। কিন্তু বিদেশী সোডার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার আশা না থাকাতে তিনি সে চেষ্টা ত্যাগ করেন। তারপরে দেশীয় সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে হাড় থেকে জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত সুপার-ফসফেট এবং ঔষধে ব্যবহৃত লৌহ, আয়োডিন, আর্সেনিক ও বিসমাথঘটিত খনিজ বস্তু ও কয়েকটি কৃত্রিম জৈব ঔষধ প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। ইথার নামক সম্মোহক ঔষধও প্রস্তুত আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু কার্যকালে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে এ কার্যে বিরত হন। তারপরে কয়েকজন নিষ্ঠাবান সহকর্মীর সহযোগে বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস প্রতিষ্ঠিত করে নূতন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করেন। প্রায় প্রথম থেকেই প্রখ্যাতনামা ডাক্তার-দের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করায় তাঁর তৈরি ঔষধ চিকিৎসক সমাজে ব্যবহৃত এবং আদৃত হতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমশ কলিকাতার ডাক্তারখানাগুলিতে অল্পে অল্পে বিলাতি ঔষধের পাশে স্থান পেতে

থাকে। কলিকাতায় প্রসারের পর কলিকাতার বাইরেও কিছু কিছু চাহিদা হতে থাকে। অন্য দিকে কয়েকজন বিখ্যাত কবিরাজের কাছে উপদেশ এবং উৎসাহ পেয়ে তিনি কালমেঘ, বাসক, কুড়চি, যোয়ান ইত্যাদি দেশীয় ঔষধ থেকে তরলসার প্রস্তুত আরম্ভ করেন। এগুলি প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ গৃহস্থের ঘরে ঘরে আদর পেতে থাকে এবং এই ব্যবসা উত্তরোত্তর লাভজনক হতে থাকে। বর্তমানে এই কারখানা ভারতের সর্ববৃহৎ এবং সর্বপ্রধান ঔষধ প্রস্তুতের কেন্দ্র বললেও অত্যুক্তি হবে না। এখন নানা প্রকার বিলাতি ঔষধ, গাছগাছড়া থেকে তৈরি নানা ঔষধ, সূচিপ্রয়োগে ব্যবহৃত নানা জৈব ও অজৈব বস্তু, ব্যাণ্ডেজ, তুলা ও অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত নানা বস্তু, নানাজাতীয় সাবান, সুগন্ধি তৈল ও অন্যান্য প্রসাধন বস্তু, রসায়নাগারে ব্যবহৃত রাসায়নিক বস্তু, কালি, নানাপ্রকার রোগবীজনাশী ঔষধ এবং রসায়নাগারে ও হাসপাতালে ব্যবহৃত বহুপ্রকার যন্ত্রপাতি এই কারখানায় প্রস্তুত হচ্ছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বহু ছাত্র এই কারখানায় কাজ করেছেন এবং করছেন। এঁদের সম্মিলিত চেষ্টা এই রাসায়নিক শিল্পের সাহায্যে দেশের যে কী প্রভূত উপকার করেছে তা বলা যায় না।

বেঙ্গল কেমিক্যালের দেখাদেখি আরো কতকগুলি রাসায়নিক বস্তু, ও ভৈষজ্য কারখানা ভারতের নানা স্থানে স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে শুধু যে বহু ভারতীয় অর্থ ই দেশে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে তা নয়, সহস্র সহস্র লোক এখানে কাজ পেয়েছে এবং সস্তাদামে ঔষধ এবং রাসায়নিক বস্তু প্রস্তুত হওয়াতে দেশের অভাব অনেক অংশে দূর হয়েছে। প্রসাধনের ব্যবসা বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যেই অভাবনীয় উন্নতি করেছে। তার ফলে সাবান, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি বিদেশী প্রসাধনের আমদানি অনেক কমে গেছে।

এ পর্যন্ত শুধু আমাদের দেশের ভৈষজ্যশিল্পের কথাই বলা হল। ইংলণ্ড জার্মানি ও আমেরিকায় এই শিল্পের যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে তার কথা এখানে বলা সম্ভব নয়। শুধু জার্মানির মার্ক, শেরিং, বেয়ার ইত্যাদি, ইংলণ্ডের বুটস, বারোজ অ্যাণ্ড ওয়েলকাম, মে অ্যাণ্ড বেকার, পার্ক ডেভিস ইত্যাদি, এবং আমেরিকার কার্ন্ রিক, কর্ন্ প্রোডাক্টস ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত কারখানার কথা উল্লেখমাত্র করেই আমরা ক্ষান্ত হব। এদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের দেশের শিল্পগুলি গড়ে উঠেছে।

শুধু উদ্ভিজ্জ প্রাণীজ এবং খনিজ বস্তু থেকে উৎপন্ন ঔষধ ছাড়াও বর্তমান যুগে বহু সম্পূর্ণ কৃত্রিম ঔষধ রসায়নাগারে প্রস্তুত হয়ে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছে। এগুলির সংখ্যা বর্তমানে অনেক ; তবে বিশেষভাবে নাম করা যায়, ম্যালেরিয়ার জন্য অ্যাটেব্রিন এবং প্ল্যাস্মো-কুইন, বাত এবং নানারূপ বেদনার জন্য ফেনাসিটিন, অ্যান্টিপাইরিন, পিরামিডিন, অ্যাটোফ্যান ইত্যাদি ; রোগবীজনিবারক হিসাবে ফরম্যালিন, ফরমামিণ্ট, ইউরোট্রোপিন, স্যালিসিলিক অ্যাসিড, স্যালল, অ্যাক্রিফ্লোভিন, মিথিলিন ব্লু, মারকিউরোক্রম ইত্যাদি ; অস্ত্রোপচারের আগে সংজ্ঞা লোপের জন্য ঈথার, ক্লোরোফরম, নোভোকেন, প্রোকেন, ইউকেন ইত্যাদি ; এবং হৃদযন্ত্রের দুর্বলতায় কার্ডিয়াজল, কোরামিন ইত্যাদি। এইগুলির নাম এবং ব্যবহার এখন প্রায় সকল গৃহস্থই জানেন। আল-কাতরার পাতনে উৎপন্ন নানা বস্তু থেকেই এগুলি তৈরি হয়, সুতরাং এই শিল্প আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতীয় রসায়নীরা এগুলি প্রস্তুত করতে সক্ষম হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। এরই মধ্যে কয়েকটি বস্তু দেশীয় কারখানায় তৈরি হতে আরম্ভ হয়েছে। এই ভাবেই দেশের বহু অর্থ দেশে থেকে যাবে।

এখন মানুষের শক্তি, সম্পদ ও আরাম বৃদ্ধির কাজে রসায়ন কী ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তার একটু আলোচনা করা যাক। এই ব্যাপারে অন্য দেশের তুলনায় জার্মানির দান এত বেশি যে, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে জার্মান রসায়নীদের দেশব্যাপী অক্লান্ত সাধনার ফলাফল উল্লেখ করলেই এ বিষয় পরিস্ফুট হবে। এই উপলক্ষে রঞ্জনশিল্পেরই নাম প্রথমে মনে পড়ে, কারণ এই শিল্পই জার্মানির সকল রসায়নশিল্পের মূলে ছিল। যদিও আলকাতরা থেকে কৃত্রিম রঙের উৎপাদন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে ইংলণ্ডেই এবং তারপরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে আরম্ভ হয়, তবু এই শিল্পের প্রকৃত এবং বিস্তৃত উন্নতি জার্মানিতেই ঘটে এবং যে জার্মান রসায়নী এ. ডব্ল্যু. হফম্যানের তত্ত্বাবধানে লণ্ডনে ডব্ল্যু. এচ. পারকিন প্রথম রং তৈরি করেন, তাঁর এবং তাঁর ছাত্রদের অক্লান্ত গবেষণাতেই জার্মানিতে এই শিল্প উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে। পার্কিনের মভ্ নামক রঙের কারখানা স্থাপনের দুই বৎসর পরে দ্বিতীয় কৃত্রিম রং ম্যাজেন্টা প্রস্তুতের কারখানা ফ্রান্সে লিয়ঁ শহরে স্থাপিত হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে দুজন জার্মান রসায়নী গ্রাবে এবং লিবারম্যান মঞ্জিতের লাল রংটি আলকাতরার পাতনে উৎপন্ন অ্যান্থ্রাসিন থেকে তৈরি করতে সক্ষম হন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্কিন তাঁর কারখানায় এরও প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হফ্ম্যানের তত্ত্বাবধানে পিটার গ্রিস সম্পূর্ণ নূতন জাতীয় রং (azo-colours) আবিষ্কার করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হফ্ম্যান জার্মানিতে ফিরে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশ থেকে আগত ছাত্রমণ্ডলীর সাহায্যে অনেক নূতন রং তৈরি করতে আরম্ভ করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আলকাতরার পাতনশিল্পের উন্নতি হতে থাকে এবং এ থেকে জাত বহু রাসায়নিক বস্তু রং তৈরির কাজে লাগতে থাকে। এই সময়েই জার্মান রসায়নী বেয়ার ভারতীয় নীল রঙের রাসায়নিক প্রকৃতি

নির্ধারণ করেন এবং কৃত্রিম উপায়ে এর উৎপাদনের চেষ্টায় লিপ্ত হন কিন্তু এই চেষ্টা রসায়নাগারে সফল হলেও কারখানায় বহুল পরিমাণে প্রস্তুতির সময় তখন আসেনি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে হিনম্যানের (Henmann) আবিষ্কৃত নূতন পদ্ধতি ব্যবহার করার ফলে নীলের প্রস্তুতি সম্যক্‌ভাবে আরম্ভ হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নীলের চাষে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড নীল উৎপন্ন এবং ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এর পরিমাণ ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড হয় এবং ৬ কোটি টাকা মূল্যে তা বিক্রয় হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ বৎসরের প্রতিযোগিতার ফলে নীলের চাষ যথেষ্ট কমে যায় এবং ক্ষেত্রজ নীলের পরিমাণ ৬০ লক্ষ টাকায় নেমে যায়। পরন্তু ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি ১ কোটি ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড কৃত্রিম অথচ বিশুদ্ধ নীল ১ কোটি টাকা দামে অর্থাৎ স্বাভাবিক নীলের প্রায় অর্ধেক দামে বিক্রয় করতে সক্ষম হয়।

নীলের মতো মঞ্জিতের রং তৈরির ব্যবসায়ও এই ভাবে অতি অল্পসময়ে জার্মানির হাতে চলে যায়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স এবং এশিয়া মাইনরে এই রং ৭০ হাজার টন পরিমাণে জন্মায় এবং তার দাম ছিল দেড় কোটি টাকা। অথচ এর মধ্যে প্রকৃত রং থাকত মাত্র ১৫ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মঞ্জিষ্ঠার এই রং alizarin নামে কৃত্রিম অথচ বিশুদ্ধভাবে তৈরি হয় ৪০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণে এবং স্বাভাবিক রঙের চেয়ে কম দামে সেটা বিক্রয় হতে থাকে। সুতরাং এই ব্যবসায়ও জার্মানির হাতেই চলে যায়।

১৮৮০ থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই জার্মান শিল্পের এত উন্নতি হয়েছিল যে ওই বৎসরে দেখা গেল যে ইংলণ্ডে ব্যবহৃত রঙের শতকরা ৯০ ভাগই জার্মানি থেকে আমদানি হচ্ছে। ইংরেজ এবং ফরাসী রসায়নীরা তখনও এই পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ ফলাফল উপলব্ধি করেননি। রঙের

শিল্পের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্লোরিন ব্রোমিন সোডা পটাশ অ্যামোনিয়া ইত্যাদিরও উৎপাদন উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। শাসক সম্প্রদায়ের অকাতরে অর্থব্যয় এবং অবিরত উৎসাহদানের ফলে জার্মান রসায়ন শিল্পজাত বস্তু ক্রমশই নূতন নূতন দেশে রপ্তানি হতে থাকে এবং এই ব্যবসায়ের লাভও এত বেশি হয় যে অন্যান্য দেশের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রং, ঔষধ এবং রাসায়নিক বস্তুর ব্যবসায়ে জার্মানি পৃথিবীর সকল দেশের অগ্রণী হয়ে ওঠে এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দেশের রপ্তানি ব্যবসা ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। এই পরাজয়ের জ্বালা মিটতে না মিটতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্রিম উপায়ে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতের পদ্ধতি জার্মানিতে বিখ্যাত রসায়নী হাবারের (Haber) দ্বারা আবিষ্কৃত হয় এবং জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত অ্যামোনিয়া-সালফেট বহুল পরিমাণে তৈরি হতে থাকে। এ ছাড়া সকল প্রকার বিস্ফোরক প্রস্তুতের মূলে যে নাইট্রিক অ্যাসিড, তাও অস্‌ওয়াল্ডের পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া থেকে উৎপাদনের উপায় হয়। এই ভাবে একটি একটি করে জার্মান কারখানায় তৈরি মাল পৃথিবীর বাজার ছেয়ে ফেলতে থাকে এবং অন্য দেশের শাসক সম্প্রদায় নিজেদের দেশের রপ্তানি ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর হ্রাস দেখে ক্রুদ্ধ এবং উৎকণ্ঠিত হতে থাকেন। যুদ্ধ ছাড়া এই সংকটের অন্য মীমাংসা ভেবে পাওয়া গেল না। সুতরাং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধ অনিবার্যভাবেই আরম্ভ হল।

জার্মানির রসায়নশিল্প এই ভাবে যুদ্ধ বাধাল বটে, কিন্তু যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এর ক্রমোন্নতি থামল না। বরং যুদ্ধের কাজে নানা নূতন নূতন বস্তু আবশ্যক হতে লাগল। এর ভিতর নানা জাতীয় দ্রাবকের (solvent) উল্লেখ করা যায়। করডাইট (cordite) ইত্যাদি বিস্ফোরক তৈরির জন্য

অ্যাসিটোন (acetone) নামক দ্রাবকের আবশ্যক হওয়াতে ফার্নবাক্ (Fernback) শ্বেতসারের একপ্রকার বিশেষ জারণের (fermentation) সাহায্যে এই বস্তু এবং বিউটাইল অ্যালকোহল (butyle alcohol) তৈরি করলেন। শেষোক্ত বস্তুটিও বার্নিশের উপাদান হিসাবে খুব কাজে লেগে গেল। অন্য জাতীয় জারণ-ক্রিয়ায় গ্লিসারিন, সিট্রিক অ্যাসিড এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হতে লাগল।

স্যাবেশিয়ার এবং সেণ্ডেরেন্স নামক দুইজন ফরাসী রসায়নী ১৮৯৭ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিকেল ধাতুর সাহায্যে নানা বস্তুর সঙ্গে হাইড্রোজেনের যোগ ঘটিয়ে নূতন বস্তু তৈরি করছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রক্রিয়াই বিশেষ ভাবে ব্যবহার করে কার্বনিক-অক্সাইড গ্যাস থেকে একজন জার্মান রসায়নী মিথাইল অ্যালকোহল তৈরি করতে সক্ষম হলেন। এই অ্যালকোহল দ্রাবক এবং অন্য নানা আকারে শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এটি তৈরি করার নূতন সহজ উপায় শীঘ্রই আবার বহু উপকারে লেগে গেল। এর পর আবার ফ্রেডরিক বার্জিয়াস নামক আর-এক রসায়নী কয়লা এবং খনিজ তৈলের সঙ্গে হাইড্রোজেনের মিলন ঘটিয়ে যখন পেট্রোল জাতীয় উৎকৃষ্ট দাহ্যে পরিণত করলেন তখন পেট্রোলহীন জার্মানিতে যেন যুগান্তর উপস্থিত হল। এর পর এফ. ফিশার কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস থেকেই পেট্রোল জাতীয় দাহ্য তৈরি করতে সক্ষম হন এবং এর ফলে জার্মানির অভাব অনেকাংশে দূর হয়, তার শক্তিরও যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। এই সব আবিষ্কারের ফলে জার্মানিতে অনেক নূতন শিল্প স্থাপিত হয়েছে এবং অনেক ব্যাপারে তার পরমুখাপেক্ষিতা দূর হয়েছে।

ধাতুশিল্পের ভিত্তিও রসায়নের উপরেই স্থাপিত। লোহা, তামা, রাং, দস্তা, সীসা ইত্যাদির নিষ্কাশন ও শোধনে এবং নানা জাতীয় খনিজ

লবণের প্রস্তুতি ও রূপান্তরে রসায়নের কাজই প্রধান। এই সব ধাতু যে মানব-সভ্যতার উন্মেষে এবং মানব-সমাজের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধিতে কত কাজে লেগেছে তা বলার আবশ্যক নেই। তবে গত কয়েক বৎসরে ধাতুশিল্পে যে যুগান্তর এসেছে তার অল্প উল্লেখ করা যাক। বক্সাইট নামক সহজ লভ্য খনিজ থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালুমিনিয়াম তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এর প্রস্তুতি আরম্ভ হয় এবং এই বহুগুণসম্পন্ন ধাতু অসংখ্য ভাবে কাজে লাগতে আরম্ভ করে। শুধু বিশুদ্ধ ধাতুর আকারে নয়, আবার শতকরা ৪ভাগ তামা, ০·৫ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ এবং ০·৫ ভাগ ম্যাগনিসিয়াম মিশিয়ে এই ধাতু থেকে ডিউরেলুমিন নামক যে মিশ্র ধাতুর উদ্ভব হয়েছে তা গত যুদ্ধের সময় থেকে এরোপ্লেনের শরীর, ডানা ও অন্যান্য আবশ্যক অংশ তৈরির কাজে বিশেষ সহায়তা করেছে। কারণ এই মিশ্র ধাতু খুবই হালকা হলেও সমান আয়তনের ইস্পাতের চেয়ে কম দৃঢ় এবং ভারসহ নয়। আর-একটি হালকা ধাতু—ম্যাগনিসিয়ামও গত যুদ্ধের সময় থেকে বিস্তৃত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দস্তার সঙ্গে মিশ্রিত করে এ যে ইলেকট্রন ধাতু তৈরি হয়েছে তা জার্মানিতে, এবং ম্যাঙ্গানিজ ও অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে মিশ্রণে উৎপন্ন ডো-মেটাল (dow metal) আমেরিকায় এরোপ্লেন এবং অন্যান্য আবশ্যক যুগোপযোগী যন্ত্রাদি প্রস্তুতের কাজে ব্যবহার হচ্ছে। তাছাড়া টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম, ভ্যানাডিয়াম এবং মলিব্‌ডিনাম্‌ ইত্যাদি পূর্বে অব্যবহৃত ধাতু ও লোহা এবং ইস্পাতের সঙ্গে মিশ্রিত ভাবে নানা বিশেষ যন্ত্র ও যন্ত্রাংশে প্রচুর ব্যবহৃত হচ্ছে। গত যুদ্ধের সময় লোহা এবং ইস্পাতের যে প্রাধান্য ছিল বর্তমান যুদ্ধে অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনিসিয়াম ও বেরিলিয়াম তা লাভ করছে। এই যুগকে হালকা ধাতুর যুগ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই সব ধাতু ও নানা কৃত্রিম

রজন-জাতীয় বস্তুর সাহায্যেই আজকাল মানুষের ব্যবহার্য বহু শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত হচ্ছে। আবার এই ধাতুগুলি সহজলভ্য হওয়াতে এই বস্তুগুলি দামেও সস্তা হয়েছে।

ধাতু, রং এবং ঔষধ ইত্যাদির বিরাট শিল্পের পর আরো চারটি রাসায়নিক শিল্পের উল্লেখ করে আমাদের এই প্রবন্ধ শেষ করব। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম রবার, নানা জাতীয় প্লাস্টিক বা রজনধর্মী বস্তু, পেট্রোলিয়াম ও তদ্‌ঘটিত বস্তু এবং কৃত্রিম রেশম, এই চারিটি শিল্প বর্তমানে সকল সভ্য জাতির মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছে। রবার গাছের রস থেকে শোধিত রবার এবং তা থেকে মোটরের টায়ার, টিউব এবং অন্যান্য বহু প্রকার আবশ্যক বস্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃত্রিম ভাবে রবারের উৎপাদন রাসায়নিকের বিশেষ কীর্তি। এই ব্যাপারে জার্মান এবং আমেরিকান পদ্ধতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অ্যাসিটিলিন নামক দাহ্য গ্যাস এবং ক্লোরিনের সম্মিলনে ক্লোরোপ্রিন নামক বস্তু এবং তা থেকে আবার ডুপ্রিন (duprine) নামক কৃত্রিম রবার যুক্তরাজ্যে তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়া পেট্রোলের খনি থেকে প্রাপ্ত বিউটেন (butane) ও পেনটেন (pentane) নামক স্বাভাবিক গ্যাস থেকেও ক্লোরিন এবং ক্ষারের সাহায্যে আর-এক জাতীয় রবার তৈরি হচ্ছে। জার্মানিতে আবার শ্বেতসার থেকে প্রস্তুত বিউটাইল (butyle), অ্যালকোহল (alcohol) এবং কয়লা ও হাইড্রোজেনের মিলনে উৎপন্ন বিউটেন (butane) থেকে প্রস্তুত বিউটাডিন (butadine) থেকে বুনা (buna) নামক কৃত্রিম রবার তৈরি হয়েছে। বর্তমান যুদ্ধের তাড়নায় আমদানি হ্রাস হওয়ায় এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন রবারই স্বাভাবিক রবারের কাজ কতকাংশে করছে। এই শিল্পের আরো প্রসার হলে যবদ্বীপ ও সুমাত্রার রবারগাছের উপর আর নির্ভর

করতে হবে না এবং হয়তো নীল ও মঞ্জিতের রঙের মতো এই ব্যাপারও এই দুই দেশের হাতে চলে যাবে।

মাটি, পাথর, ধাতু প্রভৃতি স্বাভাবিক এবং চিনামাটি ও কাচ প্রভৃতি কৃত্রিম অজৈব খনিজ বস্তু থেকে যেমন নানা ব্যবহার্য বস্তু তৈরি হয়, তেমনি গালা, রজন ও অ্যাম্বার (amber) ইত্যাদি স্বাভাবিক জৈব বস্তুও অনেক শিল্পদ্রব্যের প্রস্তুতিতে কাজে লেগে আসছে। কৃত্রিম জৈব বস্তুর মধ্যে প্রথমে সেলুলয়েডই এই কাজে ব্যবহৃত হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তুলা ইত্যাদি সেলুলোজ-প্রধান দ্রব্য থেকে নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের যোগে তৈরি নাইট্রোসেলুলোজ থেকে কর্পূরের মিশ্রণে এই বস্তু প্রস্তুত হয়। সেলুলয়েডের প্রচুর ব্যবহার সকলেই দেখেছেন ও জানেন। এর পর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বার্কল্যাণ্ড কার্বনিক অ্যাসিড ও ফর্মালিনের সংযোগে ব্যাকেলাইট (bakelite) নামক রজনধর্মী বা লাক্ষাধর্মী নূতন বস্তু তৈরি করেন। এর ব্যবহারও যে উত্তরোত্তর বেড়েছে তার প্রমাণও সর্বসাধারণে জানেন। তার পরে গ্লিসারিন থেকে তৈরি glyptol এবং আলকাতরা থেকে প্রাপ্ত styrene ও coumarone থেকে palystyrene এবং coumarone resin এবং ছানা থেকে তৈরি গ্যালালিথ (galalith) ইত্যাদিরও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। এই সব বস্তু বৈদ্যুতিক সুইচ, বোতলের ছিপি, ছড়ি, ছাতি ও কলমের হাতল, মোটর, এরোপ্লেন, রেডিও ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের অংশবিশেষ ইত্যাদি তৈরি হয়ে মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরাম বাড়াচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। এই বস্তুগুলি সহজে ভাঙে না বা ফাটে না ; জল, অম্ল, ক্ষার, তেল এবং রোদের ক্রিয়ায় বিকৃত হয় না, তাছাড়া এরা তাপ এবং তাড়িত প্রতিরোধ করে (অপরিবাহী)। এই সব বিশেষ গুণ কোনো স্বাভাবিক বস্তুতে একত্র

পাওয়া যায় না, সম্প্রতি আমাদের দেশে নানাজাতীয় উদ্ভিজ্জ ও খনিজ তেল থেকে দুটি উপায়ে কৃত্রিম রজন ও মোমজাতীয় বস্তু প্রস্তুতির উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। শীঘ্রই প্রচুর পরিমাণে এগুলি প্রস্তুত হতে আরম্ভ হবে।

পেট্রোলিয়াম জাতীয় দাহ্যের ব্যবহারের কথা মোটর-এরোপ্লেনের যুগে কে না জানেন! যুক্তরাজ্যে ক্যালিফোনিয়া, টেক্সাস ও মেক্সিকো, ইউরোপে রুমানিয়া এবং ককেশিয়া, এশিয়ায় পারস্যোপসাগর, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা ও যবদ্বীপ এই সব স্থানেই পেট্রোলের খনি। অশোধিত খনিজ পেট্রোলিয়ামের শোধন ও পাতনের ফলেই আমরা অ্যাভিয়েশন স্পিরিট (aviation spirit), মোটরের পেট্রোল, কেরোসিন, লিকুইড প্যারাফিন, ভ্যাসেলিন, মোম ইত্যাদি বহু ব্যবহার্য বস্তু পেয়েছি। এদের উৎপাদনে রসায়নের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। তাছাড়া কয়লা, খনিজ তেল, আলকাতরা ইত্যাদির সঙ্গে এবং কার্বনিক অক্সাইডের সঙ্গে হাইড্রোজেনের মিলন ঘটিয়ে জার্মান রসায়নী বার্জিয়াস এবং ফিশার যে পেট্রোল তৈরির উপায় বার করে দেশকে অভাবমুক্ত এবং শক্তিশালী করেছেন তার কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সব বস্তুর ব্যবহারে অবশ্য একদিকে যেমন মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম বেড়েছে, অন্যদিকে আবার এই সবের অপব্যবহারে যুদ্ধের সময় শোচনীয় ফল দেখা যাচ্ছে, তবে এই অপব্যবহারের জন্য রসায়নী দায়ী নন, দায়ী মানুষের রিপু-প্রবণতা।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ক্রস (Cross) এবং বেভান (Bevan) নামক দুজন রসায়নী তুলা ইত্যাদি সেলুলোজ-সূত্রকে কস্টিক সোডা এবং কার্বন ডাইসালফাইডের যোগে জলে দ্রবণীয় অবস্থায় আনতে সক্ষম হন। এই দ্রাবণকে সূচিমুখ নলের ভিতর দিয়ে অ্যাসিডের দ্রাবণে প্রবেশ করালে আবার সুতার আকারে সেলুলোজকে

পাওয়া যায়। উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে এই প্রণালীতে সুতাকে চিক্কণ রেশমের আকারে পরিণত করা যায়। এই সুতাকে ভিসকস সিল্ক (viscose silk) বা রেয়ন বলে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যে এই সুতার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। আবার তুলা ইত্যাদিকে নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে নাইট্রোসেলুলোজে পরিণত করে আবার তাকে রাসায়নিক উপায়ে চিক্কণ রেশমী সুতার আকারে উদ্ধার করা যায়। অথবা সেলুলোজকে অ্যামোনিয়া মিশ্রিত তুঁতের জলে দ্রাবণ করে আবার সূচিনলের সাহায্যে অ্যাসিডের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তাকে একই ভাবে পুনরুদ্ধার করা যায়। চতুর্থ উপায় সেলুলোজকে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় নূতন বস্তুতে পরিণত করে সেই বস্তুকে সুতার আকারে উদ্ধার করা যায়। এই বিভিন্ন উপায়ে তৈরি রেশমী সুতাকে ভিসকস্ (viscose) বা রেয়ন (rayon), নাইট্রেট (nitrate), কেউপ্রামনিয়াম (cuprammonium) এবং অ্যাসিটেট (acetate) সিল্ক বলা হয়। নাইট্রেট শিল্প ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে প্রস্তুত করেন হিলেয়ার দ্য শারদনে।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় দেড় লক্ষ পাউণ্ড কৃত্রিম রেশম আমদানি হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ৮ বৎসরের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন কারখানায় এর প্রস্তুতি হয় ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ কোটি পাউণ্ড। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে শুধু আমেরিকায় ১৫ কোটি পাউণ্ড কৃত্রিম রেশম ব্যবহৃত হয়। এই বস্তুর উৎপাদনে স্বাভাবিক তুলার উৎপাদন প্রায় সমান পরিমাণে কমতে থাকে এবং স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সুতার মধ্যে বেশি রেশারেশি আরম্ভ হয়। বর্তমান যুদ্ধের আগে এই উৎপাদনের পরিমাণ আরো বেড়েছিল।

কৃত্রিম রেশমের সঙ্গে তার উপযুক্ত নানা রংও আবিষ্কৃত হয়।

তাছাড়া ভিসকস রেশমকে সুতার আকারে তৈরি না করে গ্লিসারিন ও অন্য দ্রাবণের সাহায্যে কাগজের মতো পাতলা পাতের আকারও দেওয়া যায়। এই বস্তুকে সেলোফেন (cellophane) বলে। এই সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, দৃঢ় ও সুদৃশ্য বস্তু রঙিন এবং রংহীন আকারে নানা বস্তুর আবরণ হিসাবে প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের দেশেও অ্যাসিটেট প্রক্রিয়ায় এই বস্তু তৈরির উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, সকল শিল্পেই রসায়নের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে এবং সকল শিল্পের উন্নতিই রসায়নের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কৃষি ও খনিজ শিল্প ; কাচ, কাগজ, চামড়া, চিনামাটি, তুলা, রেশম ও পশম শিল্প ; রবার, পেট্রোল, কৃত্রিম রঞ্জন, অ্যাসিড, জমির সার ও অন্যান্য খনিজ লবণ এবং ভেষজ শিল্প ; কয়লা ও আলকাতরার পাতন ও তজ্জাত রং, বিস্ফোরক এবং ঔষধ শিল্প—সবই রসায়নের উপর প্রতিষ্ঠিত। রসায়নের জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব শিল্পের উন্নতি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো উন্নতি হবে। এ সম্বন্ধে অনেক উল্লেখযোগ্য তথ্য স্থানাভাবে বিবৃত করা গেল না। আশা করা যায় যে, ভারতের রসায়নীরা এই ভাবে তাঁদের জ্ঞান নানা শিল্পে প্রয়োগ করে দেশের দৈন্য এবং পরমুখাপেক্ষিতা দূর করবেন এবং সম্পদ ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। আরো আশা করা যায় যে, দেশের তরুণ বিজ্ঞান-বিদ্যার্থীরা সর্বদাই এই দিকে নিজেদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবেন এবং নিজেদের জ্ঞানকে যথাশক্তি শিল্পোন্নতির কাজে লাগাবেন।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ